আদালত- নীরব স্বাক্ষী তুমি   প্রথম পর্ব

আদন নাগরিকরা নিজেদের হাতে তুলে নেবেন না, এই কথা সব সময়ে আমরা শুনে আসছি। শ্রম এবং শ্রমিকের জন্য সেই আইন তাদের কী সুযোগ করে দিচ্ছে তা নিয়ে একটু আলোচনা করা যেতে পারে।

দেওয়ানি অথবা ফৌজদারি মামলার জন্য আপনি ব্যাঙ্কশাল কোর্টে গেলেন। আপনার মামলা পড়লো ৭ নম্বর ঘরে। এই ঘরের হাকিম সাহেব মূলত আসেন শিক্ষানবিশ হিসেবে - চালু মামলার রায় তিনি দিতে পারেন ৫০ টায় হয়তো মাত্র একটা! ফল হলো দু-তিন বছরের পুরোনো মামলা গুলো শেষ হোতে লাগছে মাত্র ১৫-১৬ বছর! গল্পকথা মোটেও নয়! এই ৭ নম্বর ঘরে গত তিন বছরে মাত্র ১৭ জন হাকিম শুধু তিন মাস পর পর নানান মামলার দিন দিয়ে গেছেন! একবার একটা মামলার বিবাদী পক্ষ সৌভাগ্যবান ছিলেন - তখনকার চালু হাকিম 'ওমুক দিন রায় ঘোষণা করা হবে' বোলে জানালেন। এমন এক ব্যতিক্রমী ঘটনার সাক্ষী থাকার লোভ সামলাতে না পেরে গিয়ে তো হাজির হলাম। গিয়ে শুনি চার দিন আগে হাকিম সাহেবের বদলির চিঠি নাকি চলে এসেছে, অতএব রায়দান স্থগিদ! এই নিয়ে এই কোর্টে এই মামলায় এমন ঘটনা হোলো মাত্র ২২ বার! বলে রাখি এই মামলাটি একটি বিখ্যাত মামলা, সুপ্রীম কোর্টের স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে যে এই মামলাটি দ্রুত শেষ করতে হবে! মামলাটি মাত্র ৩১ বছর চলছে! আরো আছে। এই কোর্টের হাকিম আবার প্রায়ই কোর্টের রেজিস্ট্রার হিসেবে কাজ করেন। সপ্তাহে অন্তত এক দিন, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দু দিন তিনি আর বিকেলে কোর্টে বসেন না। শুনানি পেছিয়ে যায়। ফলে এই ঘরের আশি শতাংশ মামলা শুনানির স্তরই পার হতে পারে না; রায়, তা সে যতই কালো হোক, তার কালো হরিণচোখের দেখা আর পাওয়া যায় না! এই কোর্টটিতে সেই ট্র্যাডিসান সমানে বহমান। এক দিন এক নির্মম ঘটনা দেখলাম। নাম বিভ্রাটে একটি মুসলমান ছেলেকে ভুমক্রমে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং সেই ভুল ধরা পরেছে। প্রথমে তার জামিন হবে, পরে সে বেকসুর পাবে। জামিনের কাগজপত্র প্রস্তুত, কিন্তু ..... । হাকিম সাহেব রেজিস্ট্রারের কাজে অন্য কোর্টে, অতএব অপেক্ষা। বিকেল ৩টের পর হাজত থেকে আসামী ছাড়ে না। হাকিম সাহেব কোনোমতেই সাড়ে চারটের আগে আসতে পারলেন না, ছেলেটির পক্ষের উকিলবাবু ব্যাঙ্কশাল কোর্ট-সিটি সিভিল কোর্ট- ৫ নম্বর ঘর সঙ্গে একবার আলিপুর কোর্ট দৌড়োদৌড়ি করে হয়রান, হাকিমের দস্তখত হোলেই ছেলেটির জামিন পাকা কিন্তু সময়ের গোলোযোগ ঘটায় ছেলেটির আর সেদিন জামিন হোলো না - নিরপরাধ ছেলেটির অশ্রুজলে আদালত কক্ষ সিক্ত হলো। ... কতটুকু ক্ষতি এই প্রাণীটির হোলো আদালতের তাতে কি বা আসে যায়!

শোনা যায় আদালতে হাকিমের অভাবে এই অসীম নৈরাজ্য অবাধে বিরাজমান। উকিলবাবু আর মক্কেলবাবুদের অক্লান্ত চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকার নড়েচড়ে বসে মুন্সেফ পরীক্ষার বিজ্ঞাপন দিলেন, পরীক্ষা নির্বিঘ্নে নিষ্পন্ন হলো। পরীক্ষার ভিত্তিতে প্রার্থী নির্বাচন শেষ। প্রার্থীরা যথাবিহিত নিয়োগপত্র পেয়ে গেলেন। গোল বাধলো তারপর। যে ১৮টি কোর্টের জন্য এই নির্বাচন, দেখা গেলো তাদের কোর্টঘর গুলো আদৌ ঠিক নেই, এই নতুন চাকরি পাওয়া লোকেদের বসতে দেওয়ার যায়গাই নেই। অতএব তাঁদের চাকরিতে যোগ দিতে দেওয়া হোলো না। তাঁরা দলবদ্ধভাবে আবার সেই আদালতেরই দ্বারস্থ হলেন, কিন্তু এবার যেতে হলো সুপ্রীম কোর্টে। সুপ্রীম কোর্ট পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে বকাবকি দিয়ে বলে ডিম পাড়ার আগে ভাবা উচিত ছিলো, নিয়োগপত্র দেওয়ার আগে ঘর সারিয়ে নাওনি কেন! এত কান্ডের পর, দু বার আদালত অবমাননা-র নোটিশ পাওয়ার পরে সরকার শেষ পর্যন্ত নতুন করে নিয়োগপত্র ছাড়লো। কিন্তু তাঁরা পোস্টিং পেলেন না। অতএব আবাব সুপ্রীম কোর্ট, আদালত অবমাননা, ভৎসনা এবং ..... ঘটমান বর্তমান। আমরা ট্র্যাডিসনে ঘোর বিশ্বাসী। এ তো গেলো আম আদমির কিস্যা।

জেলা সদর কোর্ট থেকে কলকাতা উচ্চন্যায়ালয় - সর্বত্র সপ্তাহে এক দিন এক বেলা শ্রম এবং শ্রমিক সংক্রান্ত মামলার বিচার হয়। এই একদিনে আগের মামলার দিন পড়ে - এই আগের মামলা হয়তো ১৫ বছর চলছে! ফলে মাসে গড়ে একটা কী দুটো নতুন মামলা আদালত গ্রহন করে (ব্রেখটিয় অর্থে পাঠকরা যেন গ্রহন কথাটি গ্রহন না করেন!)। বেলা বাড়ে কিন্তু শ্রমিকের দুঃখ খণ্ডায় না। এবার আসা যাক আইনের ভাষ্যয়। কেন্দ্রিয় শ্রম আইন মোতাবেক শ্রমিকের কর্তব্য এবং তার জন্য বেতন ইত্যাদি নিয়ে নাতি-বৃহৎ ভাষ্য লভ্য, কিন্তু সমান কাজে সমান বেতনের ন্যায়নিষ্ঠ নিদান বৃটিশ আইনে থাকার কথাও ছিলোনা এবং নেইও। কিন্তু স্বাধীন ভারতের দলিত সংবিধান নির্মাতার মানসিক দিগন্তে শ্রমিক অনুপস্থিত - শ্রমিকের কথা ভাবে কেডা রে!

কিন্তু শ্রমিকের কথা ভাবার জন্য অন্তত এক ডজন কেন্দ্রিয় ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন এই পোড়া দেশে হামেহাল মজুত - তারা আবার দেশব্যাপী ভারত বনধ ডাকে ঘনঘন। কিন্তু মালিকদের রয়েছে একটিমাত্র সংগঠন আর শ্রমিকের হারাবার শৃঙ্খলটুকু ছাড়া রয়েছে কয়েক ডজন সংগঠন। তাই মজুরি নির্দ্ধারনে মালিকের বার্গেনিং পাওয়ার বেশি। স্বাধীন ভারতে আজ পর্যন্ত মালিক-মালিক বিরোধ নিয়ে কোনো মালিক আদালতের দ্বারস্থ হয়নি- শ্রমিক ইউনিয়নগুলোর বিরোধ নিয়ে আদালতে মামলার সংখ্যা অগুনতি। এইতো ক বছর আগে ন্যাশানাল ট্যানারির শ্রমিকরা একজোট হয়ে একটি প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের বিরুদ্ধে কলকাতা উচ্চন্যায়ালয়ের দ্বারস্থ্ হয়েছিলো।

ভারতে সংগঠিত শ্রমিক সংগঠনের প্রৌঢ়ত্ব প্রাপ্তি ঘটেছে (প্রথম ট্রেড ইউনিয়ন তৈরি হয়েছিলো সেই ১৯২৪ সালে), অথচ শ্রমিকদের হকের পি এফ-এর টাকা মালিক মাইনে থেকে কেটে নিয়ে ঠিকমতো জমা দিলো কিনা তা জানার আগ্রহ শ্রমিকদের থাকলেও শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন গুলোর নেই, যদি থাকতো তো তারা কবেই আন্দোলন করে শ্রমিকদের পি এফ স্লিপ মালিকদের তরফে দেওয়া এতদিনে বাধাতামূলক করে ফেলতো। এর ফল কিন্তু ভোগ করছে শ্রমিকরাই। সারা দেশের মধ্যে মালিকদের শ্রমিকের পি এফ-এর টাকা জমা না দেওয়ার তালিকায় পশ্চিমবঙ্গ গর্বের প্রথম স্থানে রয়েছে বেশ ক বছর ধরে- এই একটি বিষয়ে আমরা নরেন্দ্র মোদী ছাড়িয়ে বহুদূর এগিয়ে গেছি। এই বঙ্গে পি এফ বাকি পড়ার বিষয়ে গণতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত - বেসরকারি মালিক থেকে তিরিশ বছর ধরে শ্রমিক দরদী বাম সরকারের সংস্থাগুলো সমান দক্ষতায় শ্রমিকের হকের টাকা মেরে দিচ্ছে। একদিকে যেমন ব্যক্তি-মালিক কালোরাম বাজোরিয়া দের চটকল গুলো শ্রমিকের পাওনা টাকা মেরে পালিয়ে যায়, অন্য দিকে তেমনি উত্তরবঙ্গ পরিবহন সংস্থার মতো পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংস্থাও সমান তালে পাল্লা দিচ্ছে। এই একটি ক্ষেত্রে কেন্দ্রের দোহাই দেওয়া নিতান্তই অজুহাত - এই ক্ষেত্রে রাজ্যের হাতে যথেষ্ঠ এবং যথোপযুক্ত আইন বিদ্যমান। এই আইনের প্রয়োগ প্রায় হয়নি। প্রায় বোলছি কেননা যেখানে এই আইনের প্রয়োগ হয়েছে, সেখানে এটা কেলেংকারির পর্যায়ে চলে গেছে। নিয়ম অনুসারে এই আইনে মালিক গ্রেফতার হলে তা জামিন-অযোগ্য অপরাধ - কিন্তু সরকার অযাচিত হয়ে মালিক কে সার্টিফিকেট দিয়ে তাকে তুরন্ত জামিন করিয়েছে এবং পরে কৌশলে তার বিরুদ্ধে মামলা তুলে নিয়েছে, নাহলে নাকি সিঙ্গুরের মতো শিল্পপতিদের কাছে ভুল সংকেত যাবে! একটা মজার কথা বলে এই পর্বের নটে গাছটি মুড়োই। স্বাধীনতার প্রাক্কালে সমাজবাদী পথের পথিক নেহেরুর (পরবর্তীকালের সিপিআই-এর দেওয়া বিশেষণ, এ বিষয়ে আমরা নাচার) নেতৃত্বে ইংরাজের প্রত্যক্ষ তত্বাবধানে ভারতে শ্রম-বিরোধ নিষ্পত্তি আইন পাশ হয়, তারিখটা ছিলো ১লা এপ্রিল, ১৯৪৭! এই শ্রম-বিরোধ নিষ্পত্তি আইনই আমাদের কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলোর বেদ-বাইবেল-কোরাণ। এই এপ্রিল-ফুলের খেলা সাঙ্গ হবে কবে, কবে আসবে রাত্রির গভীর বৃন্ত ছিঁড়ে আনা ফুটন্ত সকাল।